বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ৬৫-৯০
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশের ভূমি আইন বাস্তবায়নের সমস্যা নিরূপণে রাজনৈতিক অর্থনীতিভিত্তিক বিশ্লেষণ: একটি পদ্ধতিতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

আবুল বারকাত*
আসমার ওসমান**

সারসংক্ষেপ *'ভূমি' (land) বলতে আমরা বুঝি, জমি– কৃষি ও অকৃষি, জলা (water-bodies) এবং জঙ্গল (বন, forest অর্থে)। অর্থাৎ 'ভূমি' শুধু কৃষি জমি নয়; 'ভূমি' মানে কৃষি জমি, অকৃষি জমি, জলা-জঙ্গল-বন। ভূমির উপর অধিকার অর্থনৈতিক তো বটেই, একইসাথে, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতারও পরিমাপক। বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়ন পথরেখা বা মডেলে ভূমি অন্যতম প্রধান উপাদান। ভূমির অধিকার নিয়ে বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পেছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগ নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিমূলক যে আইনি-কাঠামো প্রয়োজন তা অনুপস্থিত। প্রায়োগিক দিক থেকে সংশ্লিষ্ট আইনগুলো দরিদ্রবান্ধব নয়, নয় জনকল্যাণমুখী। প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত এবং প্রায়োগিক সমস্যা তৈরি করে তীব্র ভূমি বিরোধ। আইনি বাস্তবায়নের বিষয়টি এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে 'বাদ পড়া' জনগোষ্ঠীকে 'অন্তর্ভুক্ত' করা সম্ভব হয়। সমাধান-যাত্রায় সুফল পাওয়ার জন্য প্রয়োজন নিবিড় গবেষণা—যা ভূমি আইনের সমস্যাগুলোর মূল কারণসমূহ চিহ্নিত করবে, যা সমাধানের জ্ঞানভিত্তিক নৈতিক কাঠামো প্রণয়ন এবং রূপায়ণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কিন্তু, এ ধরনের গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি কী ধরনের, তার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে গবেষণাফলাফল দেশে বিদ্যমান আর্থসামাজিক কাঠামোর কোন স্তরের মানুষকে কতটুকু সুফল এনে দেবে। দেশের দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ভূমিসংশ্লিষ্ট সরাসরি জীবিকা যাদের—কৃষি-জল-বন—তাদের উন্নয়ন যদি অভীষ্ট ধরি, তাহলে গবেষণাতাত্ত্বিক কোন কাঠামো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভে তুলনামূলক অধিক কার্যকর হবে—সেটি আলোচনা করা হয়েছে এখানে। পাঁচটি নমুনা আইন, যার সাথে কৃষক-দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক মানষের প্রকৃত, অধিকারভিত্তিক উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক-বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক অর্থনীতি (political economy)-ভিত্তিক বিশ্লেষণ সঠিকতার কোন*

* অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)। সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ই-মেইল: barkatabul71@gmail.com

** এমএসএস (অর্থনীতি): গবেষণা পরামর্শক, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার

মাত্রায় ফলাফল দেয়, তা নির্ধারণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে। ভূমি আইন এবং সেই আইন বাস্তবায়নের সমস্যা বিশ্লেষণে "রাজনৈতিক-অর্থনীতি"ভিত্তিক হাতিয়ার (tool) ব্যবহার একটি নবতর সংযোজন এতদ্‌সংক্রান্ত ডিসকোর্সে। বিশেষ করে আমরা এখানে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র যে 'প্রায়োগিক সংজ্ঞা' (operational definition) নির্ধারণ করেছি, সেটির যেমন তাত্ত্বিক একটি গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি একইসাথে ওই সংজ্ঞা অনুসারে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার গবেষণা পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণটিও এক্ষেত্রে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা, যা সংশ্লিষ্ট গবেষকদের চিন্তার খোরাক যোগাবে, সহায়তা করবে।

১. প্রেক্ষিত ও উদ্দেশ্য

জীবনযাত্রার মান নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান সূচক ভূমি। ভূমি[১]র উপর অধিকার অর্থনৈতিক তো বটেই, একইসাথে, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতারও পরিমাপক। জনসংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে না ভূমির পরিমাণ– বাড়ছে ভূমির মালিকানা নিয়ে প্রতিযোগিতা। ভূমিকেন্দ্রিক সহিংসতা, ফাটকা-ব্যবসা, দুর্নীতি, জবরদখল, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার ঘটনা ঘটছে নিয়তই। বাড়ছে ভূমিহীন, বলপূর্বক অভিবাসন, দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা। ভূমির উপর জনগণের পূর্ণ-অধিকার (মালিকানা-অভিগম্যতা-ব্যবহার ও তার ন্যায্য শর্তাবলী) এ দেশের 'প্রকৃত উন্নয়ন'-এর পূর্বশর্ত। বৈষম্য হ্রাসকারী উন্নয়ন পথরেখা বা মডেলে ভূমি অন্যতম প্রধান উপাদান। স্মর্তব্য, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জন্য একখণ্ড ভূমি অমূল্য সম্পদ। কৃষকের জীবন মানেই জমি এবং কৃষিই এ দেশের ৮৭ শতাংশ গ্রামীণ খানার আয়ের উৎস। জলাজীবী, বনজীবী মানুষের কাছেও ভূমি-ই একমাত্র অবলম্বন। অথচ, জীবনের প্রত্যুষেই দেখতে হয় তাদের একমাত্র অবলম্বন-আশ্রয়– সেই ভূমি অন্যের দখলে; সেখানে তারা শুধু নীরব, অসহায় দর্শকমাত্র। সেখানে কোনো সুন্দর স্বপ্ন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নেই; আছে কেবল আইনি দুঃশাসন, বিভ্রান্তি, নানান অপকৌশল এবং এসবের অনাকাঙ্ক্ষিত অপপ্রয়োগ।

এটি অনস্বীকার্য যে ভূমিই দরিদ্র, প্রান্তিক মানুষ, নারীর একমাত্র আশ্রয়। জন্মসূত্রেই তারা মাটির মানুষ, মাঠের মানুষ। জীবনের প্রাপ্তি, পূর্ণতা ভূমিকেন্দ্রিক। ভূমিই তাদের মহার্ঘ্য সম্পদ, একমাত্র অবলম্বন। মনে রাখতে হবে, ভূমির অধিকারবঞ্চিত এইসব মানুষই আমাদের প্রতিটি সূর্যোদয়ের, সূর্যাস্তের সাক্ষী; তাদের ভূমিকেন্দ্রিক জীবন-জীবিকার প্রাত্যহিক অনুসন্ধানেই ফুটে ওঠে আমাদের এই প্রিয় দেশ, সমাজের প্রকৃত ছবি। কিন্তু, তারা একে একে হারিয়েছেন ভূমির মালিকানা, এমনকি চাষাবাদের অধিকারও। ভূমির সব অধিকার হারিয়ে দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ ও নারী হারিয়েছেন তাদের শক্তি ও সৌন্দর্য। তাদের চলমান জীবন ও ভূমির অন্তর্গত সম্পর্কটি আমাদের বারংবার মনে করিয়ে দেয় ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে তাদের প্রকৃত অবস্থান; প্রতিনিয়ত মনে করিয়ে দেয় ভূমির অধিকারহারা মানুষগুলোর আর্থসামাজিক জীবনের অন্তর্লীন বৈপরীত্যকে। এই সার্বিক অবস্থা একটি প্রশ্ন আমাদের অহর্নিশ ভাবিয়ে তোলে; ভূমির অধিকারহারা দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ-নারীর জীবনে কবে বইবে সুবাতাস: ভূমি হবে দরিদ্র সাধারণ মানুষের বিস্তৃত জীবনের উজ্জ্বল, আলোকময় ক্ষেত্র? তাই প্রশ্ন জাগে, কবে হবে এই সাধারণ মানুষগুলোর জীবনে শঙ্খভোর?

ভূমির অধিকার নিয়ে এই বিরোধ, শোষণ, দুর্নীতি, প্রতারণা ও দরিদ্র মানুষের সীমাহীন দুর্গতির পেছনে সূক্ষ্ম আইনি বিষয় ও জটিলতা বহুলাংশে দায়ী। আমাদের দেশে কৃষি-ভূমি-জলাসংশ্লিষ্ট যত আইন আছে,

১ 'ভূমি' (land) বলতে আমরা বুঝি, জমি—কৃষি ও অকৃষি, জলা (water-bodies) এবং জঙ্গল (বন, forest অর্থে)। অর্থাৎ 'ভূমি' শুধু কৃষি জমি নয়; 'ভূমি' মানে কৃষি জমি, অকৃষি জমি, জলা-জঙ্গল-বন।

তার ওপর নিবিড় এক গবেষণায়[২] দেখা যায় যে বাংলাদেশে ভূমিসংশ্লিষ্ট আইনগুলো সেকেলে, ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা উভয়ই এখনো ঔপনিবেশিক নিয়মেই চলছে। সংশ্লিষ্ট আইনগুলো কোনো বিবেচনাতেই দরিদ্রবান্ধব নয়। প্রান্তিক মানুষ ও নারীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইনগুলো আদৌ যথাযথ নয়। অনেক আইন সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনই নেই, কোনো কোনো আইন আবার একে অন্যের সাথে সাংঘর্ষিক। খাদ্যনিরাপত্তা, পরিবেশের স্থায়ী উন্নয়ন; সর্বোপরি দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের বিষয়টি প্রচলিত আইনগুলোতে প্রতিফলিত নয়। বিভিন্ন সময়ে প্রণীত আইনের সংশোধনীগুলোও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ করেনি। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগ নেই। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিমূলক যে আইনি কাঠামো প্রয়োজন তা অনুপস্থিত। প্রায়োগিক দিক থেকে সংশ্লিষ্ট আইনগুলো দরিদ্রবান্ধব নয়, জনকল্যাণমুখী। প্রচলিত আইনগুলোর অন্তর্নিহিত এবং প্রায়োগিক সমস্যা তৈরি করে তীব্র ভূমি বিরোধ। ভূমি আইনকে অধিকারভিত্তিক ও সুসামঞ্জস্য একটি প্রায়োগিক কাঠামোর মধ্যে এনে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করতে না পারলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও নারীর প্রকৃত উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আইনি বাস্তবায়নের বিষয়টি এমন হওয়া প্রয়োজন, যাতে সত্যিকার অর্থে উন্নয়নে 'বাদ পড়া' জনগোষ্ঠীকে 'অন্তর্ভুক্ত' করা সম্ভব হয়।

সমাধান-যাত্রায় সুফল লাভের জন্য প্রয়োজন নিবিড় গবেষণা, যা ভূমি আইনের সমস্যাগুলোর মূল কারণসমূহ চিহ্নিত করবে; যা সমাধানের জ্ঞানভিত্তিক নৈতিক কাঠামো প্রণয়ন এবং রূপায়ণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। কিন্তু, এ ধরনের গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি কী ধরনের, তার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে গবেষণা-ফলাফল দেশে বিদ্যমান আর্থসামাজিক কাঠামোর কোন স্তরের মানুষকে কতটুকু সুফল এনে দেবে। **দেশের দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ভূমিসংশ্লিষ্ট সরাসরি জীবিকা যাদের—কৃষি-জল-বন—তাদের উন্নয়ন যদি অভীষ্ট ধরি, তাহলে গবেষণাতাত্ত্বিক কোন কাঠামো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভে তুলনামূলক অধিক কার্যকর হবে—সেটি আলোচনা করা হয়েছে এখানে। রাজনৈতিক অর্থনীতিভিত্তিক বিশ্লেষণ সঠিকতার কোন মাত্রায় ফলাফল দেয়, তা নির্ধারণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে।**

২. ভূমি আইন বাস্তবায়নের রাজনৈতিক অর্থনীতি

ভূমি এবং আইন এই দুইয়েই রয়েছে রাজনীতি এবং অর্থনীতি। একটি রাষ্ট্রে—তা সে যে চরিত্রেরই হোক না কেন—ক্ষমতাকাঠামো নির্ণায়ক হিসেবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান থাকে। আর এই উপাদানগুলো আবর্তিত হয় সম্পদকে কেন্দ্র করে। প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকেই, আর সেই পথেই রাজনীতি—যা ক্ষমতাকাঠামো ঠিক করে—ঠিক করে ভূমির উপর প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ মালিকানা এবং অধিকার কার থাকবে, কার থাকবে না। আবার, ভূমি যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ এক সম্পদ, তাই সসীম এই সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্যও তুলনামূলক বিচারে বেশি। আবার, ভূমির উপর অধিকার-মালিকানা-দখল যেহেতু ক্ষমতার পতাকাও ওড়ায় সগর্বে—তারও একটি মূল্য আছে, যা টাকার অংকে হিসেবে করা দুরূহ হলেও তা যে মূল্যবান—সেটি বলবার অপেক্ষা রাখে না। এ তো গেল ভূমির দিকটা। একই সাথে

২ দীর্ঘ পাঁচ বছরব্যাপী (২০০৯-২০১৩) পরিচালিত এই গবেষণা কাজটি বাংলাদেশের কৃষি-ভূমি-জলা-বনসংশ্লিষ্ট সব আইন ও সংশ্লিষ্ট মেমো-সার্কুলার-বিধিমালার 'অধিকারভিত্তিক' ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সংবিধানের মৌলিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন আইন প্রণয়নভিত্তিক ১৩ খণ্ডের দলিল। এই গবেষণার ব্যাপকতা, বহুমাত্রিকতা এবং পদ্ধতিতাত্ত্বিক অনন্যতা থেকে বলা যেতে পারে- সম্ভবত এটাই উপমহাদেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ ধরনের প্রথম গবেষণা দলিল। বিস্তারিত দেখুন, বারকাত, আবুল ও অন্যান্য (২০২০), *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ—প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খণ্ড ১-১৩)*। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।

অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ভূমিসংক্রান্ত আইন এবং নীতি। ভূমি আইনের রাজনৈতিক দিক অতি জোরালোভাবেই প্রকাশিত। রাজনীতি যেহেতু ক্ষমতার একটি হাতিয়ার, তাই এই হাতিয়ার ব্যবহার করে ভূমি-সম্পদের উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব স্থাপনের একটি প্রচেষ্টা সবসময়ই দৃশ্যমান। এক্ষেত্রে আইন, বেশির ভাগ সময়ই হয়ে ওঠে রাজনৈতিক-সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী। আইন রাজনীতির গতিমুখ ঠিক করতে সক্ষম নয়, বরঞ্চ রাজনীতিই নির্ধারণ করে আইন কেমন হবে বা আইন কেমন হবে না।

অর্থাৎ, এখানে বিষয় মোটা দাগে ছয়টি:

— ভূমির রাজনীতি;
— ভূমির অর্থনীতি;
— আইনের রাজনীতি;
— আইনের অর্থনীতি;
— আইন বাস্তবায়নের রাজনীতি; এবং
— আইন বাস্তবায়নের অর্থনীতি।

কিন্তু এগুলোর একে-অন্যের সাথে রয়েছে নানামুখী, নানামাত্রিক, নানান মাত্রার নানান সম্পর্ক। ভূমির রাজনীতির সাথে কখনো মেলে আইনের রাজনীতি। আবার, আইনের অর্থনীতির সাথে মেলে ভূমির অর্থনীতি। এমন পারমুটেশন-কম্বিনেশনের অংক—তত্ত্বেই ঘটে। বাস্তব জীবনে এগুলো আলাদা হয়ে থাকে না, আলাদা করাও যায় না। যদি 'ভূমি আইন বাস্তবায়ন'কে একটি একক প্রপঞ্চও ধরে নিই, তাহলেও এটির রাজনীতিকে, এর অর্থনীতি থেকে বিযুক্ত করা যাবে না।

এখানেই আসে রাজনৈতিক অর্থনীতি। এটি পরিষ্কার করে বলা ভালো যে 'ভূমি আইনের রাজনীতি'র সাথে ' ভূমি আইনের অর্থনীতি'কে যুক্ত করলে, তা কোনো অর্থেই 'ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি' হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ, 'অর্থনীতি + রাজনীতি' ≠ রাজনৈতিক অর্থনীতি'।

আবার, অর্থনীতি বলতেই যেন আমরা 'চাহিদা', 'জোগান' এবং 'মুদ্রা'-এর অতি সরলীকরণে পড়ে না যাই। আমরা প্রায়ই বিস্মৃত হই যে অর্থনীতির বিস্তার প্রকৃত অর্থেই দার্শনিক। বড়জোর, সরলীকরণের চেষ্টা করলে আমরা একে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়াদির সাথে মেলাতে পারি—যার ব্যাপ্তিও বিস্তৃত-বহুমাত্রিক। বিশেষায়িতকরণ (specialisation)-এর চক্করে আমরা বুঁদ হয়ে থাকি 'খুপড়িভুক্ত' (compertmentalised-এর বাংলা যদি ধরি 'কামরাভুক্ত', তবে আমাদের সচরাচর বিচরণ এর চেয়েও অনেক ক্ষুদ্র পরিসরে—বড়জোর অপরিসর এক 'খুপড়ি'ঘরে) দৃষ্টিভঙ্গিতে—আলোচনায় এবং বিশ্লেষণে।

এ কথা মনে রাখা চাই যে বৃহৎ পরিসরে, বড়-পর্দায় দেখা ব্যতীত গভীরে-অতিগভীরে প্রোথিত কোনো সমস্যা কিংবা বিষয়ের প্রকৃত স্বরূপ কখনোই উন্মোচিত হয় না। আবারও মনে করাই যে, রাজনীতি এবং অর্থনীতিকে মেলালেই তা রাজনৈতিক অর্থনীতি হয়ে ওঠে না; বরঞ্চ এটি অতি শক্তিশালী এক বিশ্লেষণ কৌশল—যা বহিরঙ্গের মধ্যে থেকেও বাস্তবতার গভীরে প্রবেশ করতে পারে। আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনায় নেমেছি, অর্থাৎ বাংলাদেশের ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা, তার অনুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণের জন্য রাজনৈতিক অর্থনীতি হতে পারে শক্তিশালী এক হাতিয়ার।

রাজনৈতিক অর্থনীতি বলতে আমরা কী বুঝি—সেটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বিশেষ করে এ দেশের ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা বুঝতে কেন আমরা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতি বুঝতে চাই—সেটিই পরিষ্কার করতে চাই।

রাজনৈতিক অর্থনীতি বলতে আমরা বুঝি যে শোষিতের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্তটুকু শাসক (না'কি শোষক?) যে প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যবস্থাপনা করে এবং সর্বোপরি আত্মসাৎ করে। অর্থাৎ, রাজনৈতিক অর্থনীতি সেই পথ-পদ্ধতিটিই আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যা ব্যবহার করে শাসক কায়েম রাখে শাসনব্যবস্থা।

আমাদের প্রেক্ষিতে (শুধু আমাদের বলি কেন, বিশ্বের নানান প্রান্তে—নানান চেহারায়, নানান মাত্রায় একই বিষয় বিদ্যমান), ভূমিকে কেন্দ্র করে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড-উদ্ভূত প্রাপ্তি (কোনো অর্থেই শুধু ফসল নয়) তার উদ্বৃত্ত কীভাবে শাসক শ্রেণি নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আত্মসাৎ কওে, তা তাত্ত্বিকভাবেই রাজনৈতিক অর্থনীতির উপজীব্য একটি বিষয়। বলা ভালো, রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি 'ক্ল্যাসিক' উদাহরণ এটি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে 'আইন' আসছে কোথা থেকে? উত্তরটা সরল। যদিও তার পূর্বাপর মোটেও সরল নয়। আমাদের অনুধ্যানে 'আইন' এখানে হাতিয়ার মাত্র, যা পূর্বেই উল্লিখিত শাসক শ্রেণির পক্ষে আত্মসাৎ প্রক্রিয়াকে সচল রাখে—একটি শ্রেণিভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে। অর্থাৎ, আইন এবং তার বাস্তবায়ন (বাস্তবায়ন নিজেও কিন্তু একটি আইনি বিষয়) এমন এক 'জাদুকরি' (মন্দ জাদু বলাই ভালো) হাতিয়ার হিসেবে কাজ কওে, যা শাসিত বা শোষিত শ্রেণির ভূমিনির্ভর অর্থনৈতিক উৎপাদনের উদ্বৃত্তটুকু রীতিমতো ঘটা করে শাসক বা শোষকের আত্মসাৎ উপযোগী করে তার পাতে তুলে দেয়। এখানে উৎপাদন পদ্ধতি বা অর্থনৈতিক কৌশল যাই থাকুক না কেন—দাসপ্রথা, সামন্ততন্ত্র বা জমিদারি, সমাজতন্ত্র কিংবা পুঁজিবাদ, অথবা এসবের মিশ্র কোনো হাইব্রিড—আইন এবং তার বাস্তবায়ন পদ্ধতির 'সুফল' (পড়তে হবে, আত্মসাৎকৃত অন্যায্য উদ্বৃত্ত) কোনো একটি 'শ্রেণি'ই পায়, সবাই পায় না—আইন এবং তার বাস্তবায়ন কাজ করে অমোঘ হাতিয়ার হিসেবে, শাসক বা শোষকের স্বার্থ রক্ষাই যার একমাত্র লক্ষ্য।

যতক্ষণ না, শাসক এবং শাসিত একই সত্তা হচ্ছেন অর্থাৎ, "শাসক = শাসিত" না হচ্ছেন, অথবা নিদেনপক্ষে 'প্রায়' সমান (শাসক ≅ শাসিত) না হচ্ছেন; ততক্ষণ পর্যন্ত আইন এবং তার বাস্তবায়ন শুধু শাসক বা শোষক শ্রেণির হয়েই বিরাজমান থাকবে—আইনের দেবী থেমিসের সাধ্য নেই যে নিজের চোখ বেঁধে সবাইকে একই দাঁড়িপাল্লায় মাপবেন; শাসিক বা শোষিত শ্রেণি ওজনে বরাবরই কম পাবেন, কিংবা পাবেনই না আদৌ, অথবা পেলেও শাসক বা শোষকের ছড়িয়ে দেওয়া খুদকুঁড়োটুকু পেয়েই খুশি থাকতে হবে—যাকে আবার অনেকেই 'ট্রিকেলডাউন ইফেক্ট' বলে, তার সুফল ভেবে আত্মতৃপ্ত থাকতে চান।

এখানে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো: যেখানে 'শাসক = শাসিত' হওয়াটাই আদর্শ অবস্থা, যেখানে আমরা কেন শাসন এবং শাসিতের 'প্রায় সমান (≅)' অবস্থার কথাও বললাম? এর উত্তর একটু পর দেব। তবে, এ কথা নিশ্চিত করেই বলা যায় যে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থায়, আর সব ক্ষেত্রের মতোই, ভূমি আইনের বাস্তবায়ন ঐতিহাসিকভাবেই এমন করেই হয়ে আসছে যেন 'শাসিত' কখনোই 'শাসক'-এর সমান তো দূরের কথা কাছাকাছিও হয়ে উঠতে না পারেন। বরঞ্চ আইন এবং আইনের বাস্তবায়ন এমনভাবেই হয় যেন ওই উদ্বৃত্তটুকু আত্মসাৎ করতে শাসকের কোনোই বেগ না পেতে হয়; কোনো দিক থেকে কোনো রকম বাধা আসবার সব সম্ভাবনাকেই রুদ্ধ করা হয়। বড়জোর 'সিভিল সোসাইটি'র নাম দিয়ে এক-আধটু রঙিন আশার পতাকা সামনে ঝুলিয়ে রাখবার ব্যবস্থা হয় শাসকের দিক থেকেই—তাতে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য দুই ইন্ধনই থাকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সব 'বড় বড় নীতিনির্ধারক'দের দিক থেকে।

৩. ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার রাজনৈতিক অর্থনীতিভিত্তিক বিশ্লেষণ: উপযোগিতা প্রশ্ন

একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে এবং সে প্রশ্ন যৌক্তিকও বটে যে—আমরা যদি এই সিদ্ধান্তে এসেই থাকি যে ভূমি আইন শুধু শাসকের পক্ষেই যাবে এবং তা শাসিতের ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্তের ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণের নামে আত্মসাতেই ব্যবহৃত হবে, তাহলে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে কী হবে? এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট উত্তর। উত্তরগুলো কয়েকটি বর্গে বিভক্ত করা যায়। যথা—

ক জ্ঞানচর্চা একটি নির্মোহ প্রক্রিয়া। এখানে পক্ষ-বিপক্ষনির্বিশেষে নতুন তথ্য, নতুন বিশ্লেষণ, নতুন চর্চা ঘটাটাই স্বাভাবিক। এটাই সুস্থ চর্চা। এই জ্ঞানচর্চার ফল, তাৎক্ষণিকে কে পেল, সেটি বিবেচনা জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বটে, কিন্তু একমাত্র বিবেচ্য নয়।

খ পদ্ধতিতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটি গবেষণা কিংবা বিশ্লেষণ কৌশল নানান ধরনের হয়। গবেষণার ফলাফল, বিশেষ করে সামাজিক গবেষণা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণসংশ্লিষ্ট গবেষণার ক্ষেত্রে, কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তার ওপরও নির্ভরশীল। গবেষণা ফলাফল, তা যে যতই শক্ত অনুমিত ধারণার (Assumption অর্থে) ওপর ভিত্তি করে দাঁড়াক না কেন—তার গুণগতমান এবং নৈতিক গ্রহণযোগ্যতা গবেষণা পদ্ধতিতাত্ত্বিকতার ওপরও নির্ভর করে। সেই বিবেচনায়, ভূমি আইন এবং সেই আইন বাস্তবায়নের সমস্যা বিশ্লেষণে "রাজনৈতিক-অর্থনীতি"ভিত্তিক হাতিয়ার ব্যবহার একটি নবতর সংযোজন এতদ্‌সংক্রান্ত ডিসকোর্সে। বিশেষ করে, আমরা এখানে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র যে 'প্রায়োগিক সংজ্ঞা' (operational definition) নির্ধারণ করেছি সেটির যেমন তাত্ত্বিক একটি গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি একইসাথে ওই সংজ্ঞা অনুসারে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যার গবেষণা পদ্ধতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণটিও এক্ষেত্রে যুক্ত করেছে নতুন মাত্রা, যা সংশ্লিষ্ট গবেষকদের চিন্তার খোরাক জোগাবে, সহায়তা করবে।

গ কাগজে-কলমে গবেষণার গুরুত্ব আমরা অনুধাবন করি। তারপরও গবেষণাফলাফলের ব্যবহারিক দিকটিও আমরা বিবেচনায় নিই যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে, বিশেষ করে তা যদি আমাদের বিদ্যমান সমাজকাঠামোরা নিচতলার মানুষের, অধিকারহীনতা-দরিদ্র-বঞ্চনা লাঘবে একটু হলেও শক্তি জোগায় তাহলে সেই গবেষণা এবং গবেষণা ফলাফলের প্রচারণাকে আমরা নৈতিক অবস্থান থেকেই সমর্থন করি। ন্যায্যতাভিত্তিক সমাজগঠনে এটা গবেষকের দায়বদ্ধতাও বটে।

৪. নমুনা ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতিভিত্তিক বিশ্লেষণ

এ কথা আমাদের জানাই ছিল—বাংলাদেশের ভূমি আইন দরিদ্র বান্ধব নয়; নয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং নারীর ভূমি অধিকার রক্ষায় কার্যকর। জমি-জলা-জঙ্গলে যাদের অধিকার নিশ্চিত হবার কথা ছিল সর্বাগ্রে, সেই কৃষক-জলাজীবী-বনজীবী মানুষ এই পুরো প্রক্রিয়াতেই ব্রাত্যজন—সর্বাথেই অপাঙ্‌ক্তেয়, কৌলীন্যহীন। সমাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় কাঠামো—কোথাও তাদের ঠাঁই নেই, বরঞ্চ তাদের উৎপাদনের 'উদ্বৃত্তটুকু আত্মসাতের 'কারেন্ট জাল' বেছানো সর্বত্র—জাল ছিঁড়ে বেরোনোর কোনোই উপায় নেই। ভূমি আইনের সমস্যা অগুনতি। আইনে রয়েছে অসামঞ্জস্যতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, সাংঘর্ষিকতা। আর অন্যান্য গবেষণা—যার অনেকটাই এই গ্রন্থের লেখকদেরই করা—এটা নিশ্চিত করেই দিয়েছে যে: আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জবাবদিহিমূলক যে আইনি কাঠামো প্রয়োজন, তা আমাদের দেশে অনুপস্থিত।

আমরা 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র লেন্সে এ দেশের কয়েকটি ভূমি-আইন—যার সাথে কৃষক-দরিদ্র-ভূমিহীন-প্রান্তিক মানষের প্রকৃত, অধিকারভিত্তিক নিবিড় সম্পর্ক—বিশ্লেষণ করেছি, খুঁজে বের করেছি সেগুলোর বাস্তবায়ন সমস্যা, বের করতে চেয়েছি উত্তরণের পথপন্থা।

আর যদি খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন, এবং সর্বোপরি দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের সাথে ভূমির নিবিড় সম্পর্কের প্রসঙ্গগুলো টানি—তাহলে, এটি নগ্নভাবেই দৃশ্যমান যে এই অতি জরুরি বিষয়সমূহ আইনগুলোতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত নয়। আর এটাও বলা ভালো যে আইনের এসব দুর্বলতা কিন্তু কোনো 'মানবিক ভুল' (human error) নয়—এটি ইচ্ছাকৃত, দূরভিসন্ধিমূলক এবং এমনভাবেই করা, যেন সকল নৈতিকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে শাসিত সমাজের ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্ত সম্পদটুকু বিনা বাধায় আত্মসাৎ করা যায় ।

ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা বোঝার জন্য আমরা বেছে নিয়েছি ৫টি বিষয়:

১) কৃষি খাস জমি;
২) অকৃষি খাস জমি;
৩) জলমহাল;
৪) অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল; এবং
৫) ভূমি ব্যবহার।

এই পাঁচটি বিষয়কে বেছে নেবার পেছনে প্রধানতম কারণটি হলো এই বিষয়গুলোর সাথে দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষ-নারীর অধিকার এবং উন্নয়ন একই সূত্রে গাঁথা। এ দেশে কৃষি ও অকৃষি খাস জমি ও জলা কৃষিজীবী দরিদ্র এবং ভূমিহীন মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিগ্রহণ ও হুকুমদখলের নেতিবাচক প্রভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ক্ষমতাহীন মানুষ। ভূমির ন্যায্য ব্যবহার নিশ্চিত করা এই শ্রেণির প্রকৃত উন্নয়নে স্বল্প মেয়াদে তো বটেই, দীর্ঘ মেয়াদে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বিষয়সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত ৫টি আইনি দলিলের[৩] বাস্তবায়ন অবস্থার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

১) কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭;
২) অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫;
৩) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯;
৪) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭; এবং
৫) জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১।

---

৩ একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, বিষয়-সংশ্লিষ্ট এই আইনি দলিলগুলোর নাম-ই গবেষণা শুরুর আগেই এই বিষয়গুলোর প্রতি রাষ্ট্রের অবহেলার (আমাদের দৃঢ় সন্দেহ, এই অবহেলা ইচ্ছেকৃত এবং মন্দ উদ্দেশ্যে) কারণ পরিষ্কার করে দেয়। ভূমিসংক্রান্ত এত গুরুত্বপূর্ণ ৫টি বিষয়—যার সাথে কৃষিজীবী-ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষের উন্নয়ন নিবিড়ভাবে জড়িত—এর মধ্যে ৪টি বিষয়েই কোনো পূর্ণাঙ্গ আইন নেই, নীতিগুলোও বেশ পুরানো। শুধু অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল বিষয়ে রয়েছে একটি আইন, যার কোনো বিধিমালা এখনো প্রণীত হয়নি। এদেশে অগুণীত আইন, অথচ এই বিষয়ে আইন এবং বিধিমালার অনুপস্থিতি রাষ্ট্রের পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গিই দেখিয়ে দেয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে (যে দৃষ্টিতে কৃষিজীবী-ভূমিহীন-প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্বই যেন ধরা পরে না) যা শুধু হতাশা ও ক্ষোভেরই জন্ম দেয়।

আমরা অনুসন্ধান করেছি ভূমি আইন/নীতির বাস্তবায়ন সমস্যা। নিবিড়ভাবে অনসুন্ধান করেছি—বাস্তবায়ন সমস্যাগুলো কী কী, কীভাবে তৈরি হয়েছে এই বাস্তবায়ন সমস্যাগুলো (প্রক্রিয়া, দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান), সমাজের কোন কোন গোষ্ঠী (বিশেষ করে দরিদ্র মানুষ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী) এতে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং আইনের ব্যত্যয়গুলো ঘটছে কোন মাত্রায়। যে দুটি বিষয় গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা হলো: (১) অধিকারভিত্তিক ভাবনা; এবং (২) কৃষি-জলা-বনজীবী মানুষ, নারী, দরিদ্র, আদিবাসী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর 'চোখ দিয়ে দেখা' (অন্তত দেখবার চেষ্টা করেছি)।

আমরা প্রতিটি আইনের আইনি অবস্থার পাশাপাশি বাস্তবায়ন অবস্থার একটি স্কোরিং করেছি, যেন একনজরে আইনটির অবস্থা কেমন—সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, পরিস্ফুট হয় কোথায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। আইনি অবস্থার স্কোরিং করা হয়েছে ৪টি নির্দেশক ব্যবহার করে; যেগুলো হলো—(১) সাংঘর্ষিকতা, (২) অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা, (৩) প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতে অক্ষমতা বা অসামর্থ্য, এবং (৪) সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব। আইনের বাস্তবায়ন অবস্থার স্কোরিং করা হয়েছে ৮টি নির্দেশক ব্যবহার করে; যেগুলো হলো: (১) জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি, (২) দরিদ্র ও প্রান্তিক এবং নারীর সমস্যা, (৩) রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, (৪) রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন, (৫) সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর, (৬) স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব, (৭) জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি, এবং (৮) সমন্বয়হীনতা। এই স্কোরিংটি করা হয়েছে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে।[৪]

বাংলাদেশের মোট চাষযোগ্য জমির ৫.৩৪ শতাংশ খাস জমি, যার পরিমাণ ১২ লক্ষ একর। বাংলাদেশে অকৃষি খাস জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য—মোট অকৃষি খাস জমির পরিমাণ প্রায় ২৬ লাখ একর। সবকটি মেট্রোপলিটন এলাকা, পৌর এলাকা এবং থানা সদর এলাকাভুক্ত কৃষিযোগ্য খাস জমিও অকৃষি খাস জমি এবং ওইসব এলাকার বাইরে কৃষিযোগ্য জমি বাদে অন্যান্য সমস্ত জমি অকৃষি খাস জমি হিসেবে বিবেচিত (অনুচ্ছেদ ২, অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫)। সরকারি সব জমিই খাস জমি নয়। খাস জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন; সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মালিকানাধীন জমি খাস জমি নাও হতে পারে। খাস জমির প্রধান উৎসগুলো হলো: পয়োস্তি জমি[৫], নতুন সৃষ্ট চর

৪ বিশেষজ্ঞ-অভিজ্ঞজন-ভুক্তভোগীদের সাথে ভূমি আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনার সময় আমরা পূর্বনিধারিত কয়েকটি নির্দেশকের আইনি এবং তার বাস্তবায়ন অবস্থাকে '০' থেকে '৫' এর মধ্যে স্কোরিং করতে অনুরোধ করেছিলাম– যেখানে '০' নির্দেশ করে সবচেয়ে মন্দ দশা, অন্যদিকে '৫' মানে সবচেয়ে ভালো অবস্থা। এই স্কোরিং-প্রক্রিয়ায় সবাই যে সব নির্দেশকের সাপেক্ষে স্কোরিং করেছেন এমন নয়– যিনি যে বিষয়ে ভালো জানেন, তিনি শুধুমাত্র ঐ নির্দেশকের জন্যই স্কোরিং করেছেন। প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে আমরা যখন প্রতিটি নির্দেশকের জন্য গড় স্কোর বের করেছি: মোট স্কোরকে (যারা যারা যে নির্দেশকের জন্য স্কোরিং করেছেন, সেই স্কোরসমূহের যোগ) ভাগ করা হয়েছে ওই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যতজন স্কোরিং করেছেন সেই সংখ্যা দিয়ে। এক-এক নির্দেশকের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ভিন্ন। এরপর সবশেষে সব নির্দেশকের গড় স্কোরকে নির্দেশকের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে কোনো নির্দিষ্ট আইনের অবস্থার স্কোর বের করা হয়েছে। বিস্তারিত গবেষণা-পদ্ধতির জন্য দেখুন বারকাত, আ., সোহরাওয়ার্দী, গা. মো., ওসমান,আ., ও ইসলাম, মো. অ. (২০২২), ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি: *বাংলাদেশে খাস জমি*, *জলমহাল*, *অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল*, *ভূমি ব্যবহার আইন*, *নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

৫ 'পয়োস্ত' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো—সংযুক্ত বা একত্রভূত হওয়া, যাকে আইনি ভাষায় 'পয়োস্তি' বলে। কোনো জমি সাগর বা নদীর গতিপথের পরিবর্তনের কারণে কিংবা নদীর পানি সরে যাওয়ার ফলে জেগে উঠলে অথবা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া জমি পুনরায় ভেসে উঠলে তাকে পয়োস্তি বলা হয়। ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৭ ধারায় এ সম্পর্কিত বিধান রয়েছে।

জমি[৬], সিলিং-এর অতিরিক্ত জমি[৭], বাতিল মালিকানার জমি, নিলামের মাধ্যমে সংগৃহীত সরকারের জমি, রেজিস্টার ৮-এ উল্লেখিত কয়েক ধরনের জমি[৮], বিভিন্ন সরকারি এবং আধা-সরকারি সংঘের অব্যবহৃত পুকুর (বারকাত, জামান এবং রায়হান, ২০০৯)। জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও নগরায়ণ, এবং জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৈচিত্র্যায়ন যত হচ্ছে, ততই কমছে আবাদী জমির পরিমাণ; হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে খাদ্যনিরাপত্তা। তাই কৃষি খাস জমির ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। খাস জমি দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করার কথা—খাস জমি, বিশেষত কৃষি খাস জমি দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার। কিন্তু কৃষি খাস জমির কেবল ১১.৫ শতাংশ কার্যকরভাবে তাদের হাতে আছে; বাকি ৮৮.৫ শতাংশই ক্ষমতাশালী ভূমিগ্রাসীদের অবৈধ দখলে (Barkat, Suhrawardy & Rahman, 2019)। লেখচিত্র ১-এ বাংলাদেশে খাস জমির অবস্থা দেখানো আছে।

লেখচিত্র ১: বাংলাদেশে খাস জমির অবস্থা

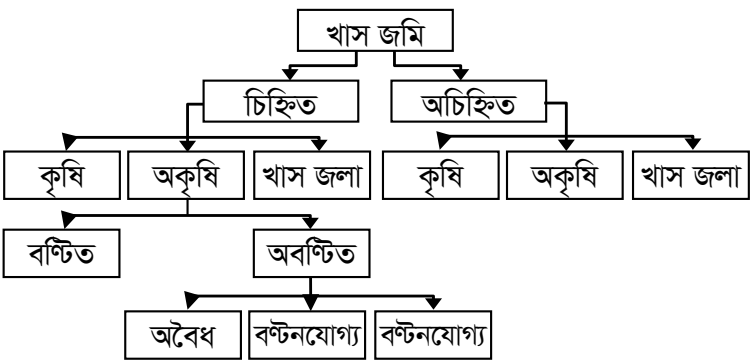

সূত্র: বারকাত, জামান এবং রায়হান (২০০৯)

খাস জমি, যা দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষেরই ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য—তা তারা পান না, পেলেও ধরে রাখতে পারেন না। এ সংশ্লিষ্ট আইনি দলিল খাস জমিতে, তা সে কৃষি কিংবা অকৃষি থেকে, 'অধিকারহীন'-এর অধিকার নিশ্চিত করে না মোটেও। আইন বাস্তবায়ন—অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা, বন্দোবস্ত এবং ধরে রাখবার (retention)

৬ 'নতুন সৃষ্ট চর জমি' হলো—নদীবাহিত পলি ও কাদা আঁকাবাকা চলার পথে নদীগর্ভে জমাট বেঁধে নদীর মোহনায় বা সঙ্গমস্থলে নতুন চরের সৃষ্টি করে অথবা অবস্থিত ভূমির আয়তন বৃদ্ধি করে। ১৯২০ সালের অ্যালুভিয়াল ল্যান্ডস অ্যাক্টে চরের জমির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এটাতে বলা হয়েছে যে: চরের জমি বলতে এমন জমিকে বোঝাবে, যা ১৮২৫ সালের বেঙ্গল অ্যালুভিয়ন অ্যান্ড ডিলুভিয়ন রেগুলেশন, ১৮৪৭ সালের বেঙ্গল অ্যালুভিয়ন অ্যান্ড ডিলুভিয়ন অ্যাক্ট অথবা ১৮৬৮ সালের বেঙ্গল অ্যালুভিয়ন (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্টে বর্ণিত উপায়ে সাগর অথবা নদীতে জেগে উঠেছে এবং এটি "Reformation In Situ" (স্বস্থানে পয়োস্তি) মতবাদকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।

৭ 'সিলিং-এর অতিরিক্ত জমি' হলো—ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি ভূমি সিলিংয়ের ৬০ (ষাট) বিঘার বেশি জমি কৃষি জমি অর্জন করে, তাহলে সেটা ভূমি সিলিং নিয়ম অনুযায়ী অতিরিক্ত জমি হিসেবে গণ্য হবে এবং ওই অতিরিক্ত জমি সরকারের কাছে অর্পিত হবে।

৮ ভূমি সংস্কার বাস্তবায়ন কর্মসূচি ১৯৮৭ অনুযায়ী অনেক ধরনের খাস জমির মধ্যে 'রেজিস্টার বা নিবন্ধনগ্রন্থ-৮ এর তিনটি অংশের খাস জমিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যথা—১) নিবন্ধনগ্রন্থ ৮-এর ২য় অংশের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমি (বন্দোবস্তের উপযোগী); ২) নিবন্ধনগ্রন্থ ৮-এর ১ম অংশের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমি (অবাধ অধিকারসহ) যেগুলোর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়েছে; এবং ৩) নিবন্ধনগ্রন্থ ৮-এর ৫ম অংশের অন্তর্ভুক্ত কৃষি (সংস্কারকৃত) জমি।

উপায়—এমনভাবেই হয় যে, সেখানে দরিদ্র-ভূমিহীন মানুষের কার্যকর কোনো অংশগ্রহণ থাকে না; বলা ভালো, থাকতে দেওয়া হয় না। যারা বন্দোবস্ত পানও কপালগুণে, তাদের সেই বহু আরাধ্য জমিটুকুর দখল বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয়েও অনুপস্থিত একটি কার্যকরী নির্দেশনা। এ ছাড়া শ্রেণিকাঠামোর গড়নটিই এমন যে বরাদ্দপ্রাপ্ত জমিটুকু ধরে রাখারও কোনো উপায় খুঁজে পান না শ্রেণিকাঠামোর মইয়ের 'নিচের ধাপের' মানুষ। আইন ও তার ব্যবস্থাপনা কাঠামোটাই এমন যে খাস জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহকগণ (যারা শাসক/শোষক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাই করেন মূলত) পুরো প্রক্রিয়াটিকেই করে তোলে স্বেচ্ছাচারমূলক—যেখানে স্পষ্ট হয়ে থাকে অধিকার, ক্ষমতা, এবং দায়িত্বের ভারসাম্যহীনতা। ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে যারা বরাদ্দ পান, তাদের জন্যও ওই বরাদ্দপ্রাপ্ত খাস জমি অধিকারে রাখার ন্যূনতম কোনো ব্যবস্থাও অনুপস্থিত। খাস জমি—কৃষি এবং অকৃষি দুই ক্ষেত্রেই—ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই শাসক শ্রেণির দ্বারা (by) এবং শাসক শ্রেণির জন্যই (for)।

দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কৃষি খাস জমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। দুই যুগ আগে প্রবর্তিত একটি নীতিমালার (কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭) মাধ্যমে কৃষি খাস জমির বণ্টন, বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে। কালের পরিক্রমায় নীতিমালাটির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক—উভয়বিধ সীমাবদ্ধতা হয়ে উঠেছে স্পষ্ট। 'অধিকার' মানদণ্ডে নীতিমালার বেশ কিছু নীতি ভালো। কিন্তু 'মন্দ' নীতিগুলোর বাস্তবায়নেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়।

'কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭'-এ সবচেয়ে খারাপ দশা দেখা যাচ্ছে 'প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতে অসামর্থ্য'—এই নির্দেশকে (স্কোর: ২.৩)। তারপর, মন্দ অবস্থার নীরিখে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে যৌথভাবে 'অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থকতা' ও 'সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/ নির্দেশনার অভাব'—এই দুইটি নির্দেশক (উভয়ের স্কোর: ৩.৪)। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে 'সাংঘর্ষিকতা' (স্কোর: ৩.৭) নির্দেশকটি। লেখচিত্র ২-এ বিষয়টি একনজরে দেখা যাচ্ছে। এই নীতিমালার ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৩.২।

লেখচিত্র ২: স্কোরিং – 'কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭'-এর আইনি সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ৩.২

অন্যদিকে 'কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭'-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় আছে—'জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি'—এই নির্দেশকটি, যার স্কোর ০.৯। এর পরের অবস্থানের নির্দেশকটি হলো 'স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব' (স্কোর, ১.১)। কাছাকাছি রকম মন্দ অবস্থায় আছে 'রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন', 'সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/ দপ্তর' এবং 'সমন্বয়হীনতা'—এই তিনটি নির্দেশক, যাদের প্রতিটিরই স্কোর ১.২। বাকি তিনটি নির্দেশকের অবস্থাও ভালো নয় মোটেও: 'জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি' (স্কোর ১.৯), 'দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা' (স্কোর ১.৮) এবং 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন'—এই নির্দেশকের স্কোর ১.৭। নীতিমালাটি বাস্তবায়নের গড় স্কোর ১.৪, অর্থাৎ মন্দ দশা, যা সন্তোষজনক নয়। লেখচিত্র ৩-এ স্কোরিংটি একনজরে দেখানো অছে।

লেখচিত্র ৩: স্কোরিং – 'কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা
("০" থেকে "৫"-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ১.৪

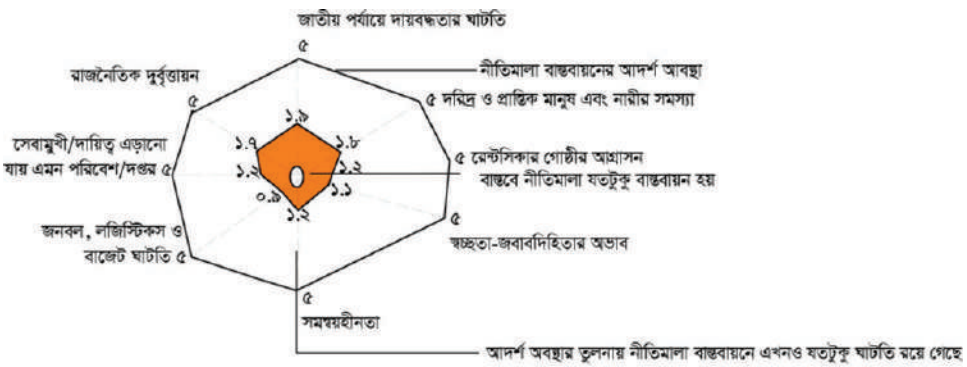

অকৃষি খাস জমিসম্পর্কিত প্রচলিত মূল আইনটি হচ্ছে 'অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫'। আড়াই দশকের পুরোনো এই নীতিমালার যেমন নীতিগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তেমনি রয়েছে ব্যবহারিক সমস্যাও। এ নীতিমালার অন্তর্নিহিত সমস্যাই অকৃষি খাস জমি বিতরণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় বাধা। সামাজিক বৈষম্য প্রশমিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি মূল উদ্দেশ্য হলেও প্রক্রিয়াগত অদক্ষতা এবং অব্যবস্থাপনার কারণে অকৃষি খাস জমির বিতরণ এবং ব্যবস্থাপনা ব্যাপক সমালোচিত একটি বিষয়।

'অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫'-এ সবচেয়ে মন্দ অবস্থা দেখা যাচ্ছে 'প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অসামর্থ্য'—এই নির্দেশকে (স্কোর: ২.২)। মন্দ অবস্থার নিরিখে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে 'সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব'—এই নির্দেশকটি, যার স্কোর ৩.৩। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে বাকি দুটি নির্দেশক, 'সাংঘর্ষিকতা' ও 'অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থকতা' (উভয়ের ক্ষেত্রেই স্কোর: ৩.৪)। লেখচিত্র-৪ এ বিষয়টি একনজরে দেখানো হলো। এই নীতিমালার ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৩.১।

লেখচিত্র ৪: স্কোরিং —'অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫'-এর আইনি সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ৩.১

অন্যদিকে, 'অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫'-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় আছে 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন' ও 'রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন'—নির্দেশক দুটি, উভয়েরই স্কোর ০.৮। এর পরের অবস্থানের নির্দেশকটি হলো 'সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর' (স্কোর: ০.৯)। কাছাকাছি মন্দ অবস্থায় আছে 'জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি', 'স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব', 'জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি' এবং 'সমন্বয়হীনতা' নির্দেশকগুলো (প্রত্যেকেরই স্কোর ১.১)। সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকা নির্দেশক 'দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা'-এর অবস্থাও ভালো নয় মোটেও; স্কোর: ১.৭। নীতিমালাটি বাস্তবায়নের গড় স্কোর ১.১, অর্থাৎ, মন্দ অবস্থা, যা মোটেও সন্তোষজনক নয়। লেখচিত্র ৫-এ স্কোরিংটি একনজরে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ৫: স্কোরিং—'অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫'-এর নীতিমালা বাস্তবায়ন সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ১.১

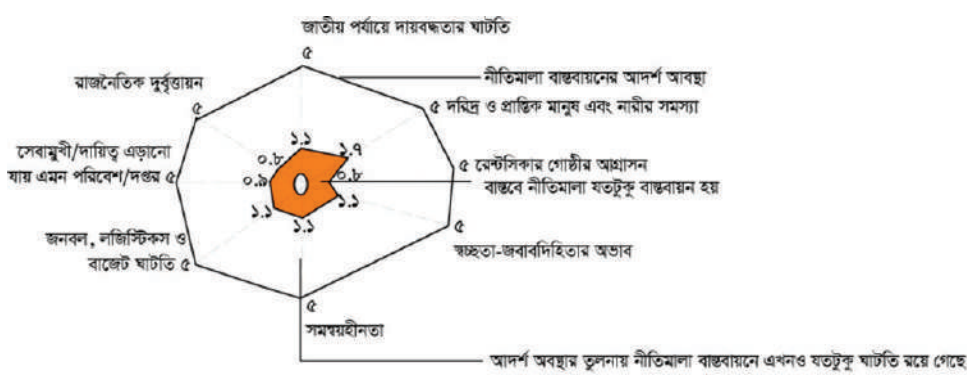

'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯' অনুযায়ী, জলমহাল হলো সেইসব জলাশয় যা বছরের একটি সময় বা সারাবছর জলমগ্ন থাকে এবং যা হাওর, বাঁওর, বিল, ঝিল, পুকুর, ডোবা, হ্রদ, দিঘি, খাল, নদী, সাগর নামে পরিচিত। জলমহাল বদ্ধ বা উন্মুক্ত হতে পারে। বদ্ধ জলমহালের নির্দিষ্ট চতুর্সীমা থাকবে এবং উন্মুক্ত জলমহালের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট চতুর্সীমা থাকবে না। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জেলা প্রশাসকদের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে জলমহালের সংখ্যা হলো: ২০ একরের ঊর্ধ্বে জলমহালের সংখ্যা ২,৪৯৭টি; ২০ একরের নিচে জলমহালের সংখ্যা ৩২,৮৪২টি। "জল যার জলা তার"—এই ন্যায্য নীতির কোনো বাস্তবায়নই দেখা যায় না সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। এ দেশের প্রায় ১ কোটি ৩২ লক্ষ মানুষের জীবন জলকেন্দ্রিক, অথচ এর দুই-তৃতীয়াংশ বাস করতে বাধ্য হন দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্যে—যার শুরুটা হয় মন্দ আইন এবং সেই মন্দ আইনের মন্দতর বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে। জলমহালসংশ্লিষ্ট আইনি দলিলকে আপাতদৃষ্টিতে মৎসজীবীদের জন্য অনুকূল মনে হতে পারে, কিন্তু আইনের বাস্তবায়ন—যা আইনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—এমনই, যে তা অতি 'সতর্ক'ভাবে এই মৎস্যজীবীদের 'বহিঃস্থ' করে রাখে। প্রবেশ করে 'মৎস্যজীবী' পরিচয়ে 'ক্ষমতাশালী মৎস্যজীবী'রা—তারাই শাসক, তারাই লুটেরা। নারী? সে তো পুরো প্রক্রিয়াতেই ব্রাত্য—ক্ষমতাহীনের মধ্যে আরও ক্ষমতাহীন। এ দেশে ১ কোটি ৩২ লক্ষ মৎস্যজীবীর মধ্যে এখন মাত্র ১০ শতাংশ এ পেশার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। জল-জলাসমৃদ্ধ বাংলাদেশে মৎস্যজীবিকার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত মানুষের অনুপাত দ্বিগুণ-তিনগুণ বাড়ানো সম্ভব, যদি দরিদ্র-অভিমুখী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়, যেখানে মূলনীতি হবে "জাল যার, জলা তার"। এর ফলে জাতীয় উৎপাদনে মৎস্য খাতের ভূমিকা হতে পারে শস্য-কৃষির সমতুল্য, এবং আয়-খাদ্য-পুষ্টিসংক্রান্ত দারিদ্র্য (income-food-nutrition poverty) দূর হতে পারে যথেষ্ট মাত্রায়। এসবই মৎস্য খাতের ১ কোটি মানুষের দারিদ্র্য হ্রাসে নিয়ামক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। মৎস্য খাতের সাথে সম্পৃক্ত ৪৩ লক্ষ হেক্টর জলাভূমি ও ৭১০ কিলোমিটার উপকূল। বছরে আনুমানিক প্রায় ১৭-১৮ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন জাতীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। মৎস্য রপ্তানি থেকে আয় বৃদ্ধি পেলেও মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতা একচুলও কমেনি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও যে দারিদ্র্য-বৈষম্য হ্রাস নাও পেতে পারে, এ দেশের মৎস্য খাত তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ এই সমীকরণ পরিবর্তন সম্ভব, যখন মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়বে আর সেই সাথে মৎস্যজীবীদের দারিদ্র্য কমবে। বিষয়টি জল-জলায় প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মালিকানা ও অভিগম্যতা প্রতিষ্ঠার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। প্রকৃত অর্থেই, এটি জলা সংস্কারের (aquarian reform) বিষয় (বারকাত, ২০১৬)।

'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯'-তে সবচেয়ে মন্দ অবস্থা দেখা যাচ্ছে 'প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অসামর্থ্য'—এই নির্দেশকে (স্কোর: ৩.১)। তারপর, মন্দ অবস্থার নিরিখে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে 'সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/ নির্দেশনার অভাব'—এই নির্দেশক (স্কোর: ৩.৩)। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে 'সাংঘর্ষিকতা' (স্কোর: ৩.৭) ও 'অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থকতা' (স্কোর: ৩.৮) —এই দুটি নির্দেশক। লেখচিত্র ৬-এ বিষয়টি একনজরে দেখা হলো। এই নীতিটির ক্ষেত্রে গড় স্কোর ৩.৫।

লেখচিত্র ৬: স্কোরিং—'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯'-এর আইনি সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ৩.৫

অন্যদিকে, 'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯'-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় আছে—'রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন' (স্কোর: ০.৬) ও 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন' (স্কোর: ০.৭) —এই দুটি নির্দেশক। এর পরের অবস্থানে রয়েছে 'দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা' এবং 'জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি' নির্দেশকদ্বয় (উভয়েরই স্কোর ০.৮)। কাছাকাছি খারাপ অবস্থানে রয়েছে 'সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/দপ্তর' ও 'স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব'—এই দুইটি স্কোর এবং এদের প্রত্যেকের স্কোর ০.৯। বাকি দুটি নির্দেশক 'জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি' ও 'সমন্বয়হীনতা'-এর অবস্থাও ভালো নয় মোটেই, স্কোর ১.১। নীতিটির বাস্তবায়নের গড় স্কোর ০.৯, অর্থাৎ অত্যন্ত মন্দ অবস্থা। লেখচিত্র ৭-এ স্কোরিংটি একনজরে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ৭: স্কোরিং—'সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ০.৯

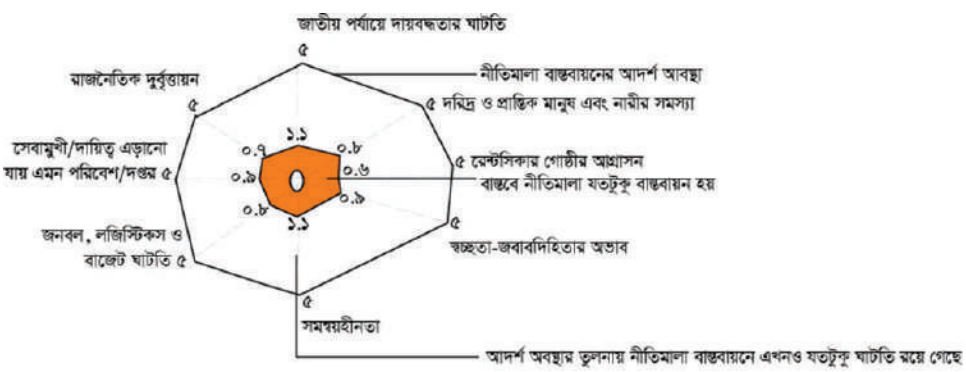

"অধিগ্রহণ' হলো ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসন বা উভয়ের বিনিময়ে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার কোনো স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব ও দখল গ্রহণ। অন্যদিকে 'হুকুমদখল' হলো ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে প্রত্যাশী ব্যক্তি বা সংস্থার সাময়িকভাবে কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখল গ্রহণ। আমাদের এই দেশে— যেখানে জনঘনত্ব অত্যধিক এবং কৃষি অতি গুরুত্বপূর্ণ খাত সামাজিক-মইয়ের নিচের দিকের মানুষের জন্য—স্বভাবতই, 'অধিগ্রহণ' এবং 'হুকুমদখল' ভূমি ডিসকোর্সে অতীব দরকারি। এ জন্য আইন আছে । কিন্তু এই আইনে উল্লেখই হয়নি 'জন-উদ্দেশ্য', 'জনস্বার্থ', 'ক্ষতিপূরণ'- এর মতো দরকারি সব শব্দের সংজ্ঞা। অন্তর্ভুক্ত হয়নি 'পুনঃবন্দোবস্তকরণ', 'পুনর্বাসন', 'দুর্বল ব্যক্তি', 'আর্থসামাজিক ব্যয়', 'পরিবেশগত ব্যয়', 'সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব' ইত্যাদির মতো বিষয়। ক্ষতিপূরণ মানেই আর্থিক (financial), অ-আর্থিক (non-financial) ক্ষতির বিষয়ে এই আইন নিশ্চুপ। অধিগ্রহণের ফলে যে ব্যক্তি স্থানান্তরে বাধ্য হন, সেই স্থানান্তরের আইনি বাধ্যবাধকতা থাকলেও এর ব্যত্যয় ঘটানোই যেন রীতি। ধনীরা ক্ষতিপূরণ পান দ্রুত, দরিদ্রদের ঘুরতে হয় দিনের পর দিন—তারপরও যদি কিছু পান, তার পরিমাণও হয় নগণ্য। হুকুমদখলের ক্ষেত্রে কিছু মানদণ্ডের কথা বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে সেসব মানদণ্ড ক্ষমতাসীনের পক্ষেই যায় শুধু। বিশেষ করে ওই জমির মালিক যদি হন দরিদ্র-প্রান্তিক-নারী-আদিবাসী-প্রতিবন্ধী তবে তো তার কণ্ঠ অশ্রুতই থেকে যায়।

'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ২০১৭'-তে সবচেয়ে মন্দ অবস্থা দেখা যাচ্ছে 'সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব'—এই নির্দেশকে (স্কোর: ১.৯)। তারপর মন্দ অবস্থার নিরিখে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে 'প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতকরণে অক্ষমতা/অসামর্থ্য'— এই নির্দেশকটি (স্কোর: ২.২)। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে 'সাংঘর্ষিকতা' (স্কোর: ৩.৭) এবং 'অস্পষ্টতা/দ্ব্যর্থকতা' (স্কোর: ৩.২)-এ দুটি নির্দেশক। লেখচিত্র ৮-এ বিষয়টি একনজরে দেখা যাচ্ছে। এই আইনের ক্ষেত্রে গড় স্কোর ২.৮।

লেখচিত্র ৮: স্কোরিং—'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ২০১৭'-এর আইনি সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ২.৮

অন্যদিকে 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ২০০৭'-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় আছে 'রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন' এবং 'সমন্বয়হীনতা' এই দুটি নির্দেশক, দুটির স্কোরই ০.৬। কাছাকাছি রকম মন্দ অবস্থায় আছে 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন' (স্কোর ০.৮) এবং 'দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা' (স্কোর ০.৭)-এ দুটি নির্দেশক। বাকি ১২টি নির্দেশকের অবস্থাও মোটেও ভালো

নয়: 'জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি', 'সেবাবিমুখী/ দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন দপ্তর' এবং 'জনবল, লজিস্টিকস ও বাজেট ঘাটতি'-এই তিনটি নির্দেশকেরই স্কোর ১.১। 'স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব' এই নির্দেশকটির স্কোর ০.৯। আইন বাস্তবায়নের গড় স্কোর মাত্র ০.৮, অর্থাৎ অতি মন্দ অবস্থা। লেখচিত্র ৯-এ স্কোরিংটি একনজরে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ৯: স্কোরিং— 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ এবং হুকুমদখল আইন, ২০১৭'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ০.৮

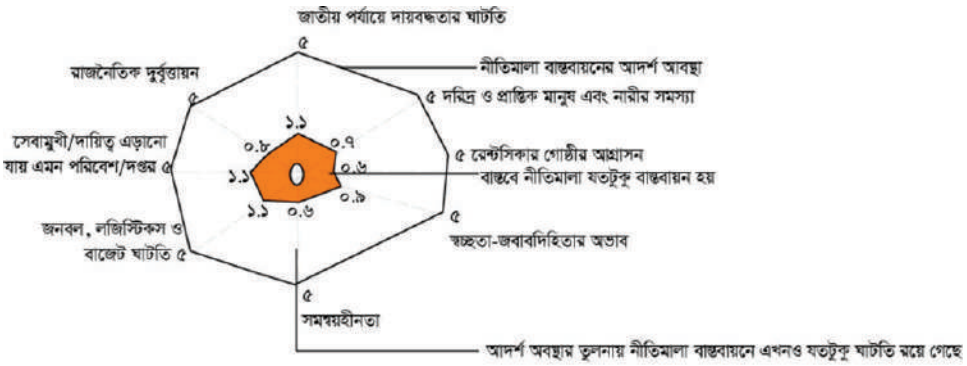

এককভাবে ভূমির সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হচ্ছে কৃষি ভূমির ব্যবহার। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শিল্পোন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হচ্ছে কৃষি; আর কৃষি উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে ভূমির যথোপযুক্ত ব্যবহার। বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ৪৫ লক্ষ হেক্টর, এর মধ্যে চাষযোগ্য জমি মাত্র ৮০ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর (মোট ভূমির প্রায় ৫৫.৩৮%)। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও শিল্পোন্নয়নের ফলে এ দেশের কৃষি ভূমি প্রতিনিয়ত কমছে। প্রতিবছর নদীগর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে প্রায় ১ হাজার হেক্টর জমি। এ ছাড়া বাড়তি জনসংখ্যার জন্য বাড়ছে আবাসন খাতে কৃষি জমির ব্যবহার। বছরে শুধু নতুন ঘর-বাড়ি নির্মিত হচ্ছে প্রায় ৭১২ হেক্টর জমিতে। নির্মাণকাজে প্রতিবছর ৩ হাজার হেক্টর জমি চিরস্থায়ীভাবে কৃষির অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। প্রতিদিন গড়ে দেশের গ্রামাঞ্চলের ২৬৮ হেক্টর কৃষি জমি অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। এ প্রক্রিয়া ক্রমবর্ধমান হারে এখনো অব্যাহত (Barkat, Suhrawardy & Osman, 2015)। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, বাণিজ্যিক কারণেও প্রতিদিন গড়ে ২৮০ হেক্টর কৃষি জমি হারিয়ে যাচ্ছে। জলাশয় ভরাটের কারণে প্রতিদিন কৃষি জমি কমছে ৯৬ বিঘা। তামাক চাষের কারণে প্রতিদিন ৯ হাজার একর কৃষি জমি উর্বরতা শক্তি হারাচ্ছে। কৃষি জমির ক্রমহ্রাসমান এ ধারা বর্তমানে মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কৃষি জমি অ-কৃষি খাতে চলে যাওয়ায় প্রতিবছর ৪০ হাজারের বেশি প্রান্তিক চাষি কৃষিকাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন (Barkat, Suhrawardy & Ghosh, 2011)। এভাবে কৃষিজমি কমতে থাকলে ভবিষ্যতে দেশে একদিকে যেমন ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়বে, একই সাথে শহরে অনানুষ্ঠানিক খাতে গ্রামের মানুষের সংখ্যা বেড়ে বস্তিয়ায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে, তেমনি অন্যদিকে দেশে খাদ্যনিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা বাড়বে। ফলে খাদ্য উৎপাদনসহ জাতীয় অর্থনীতি মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। ইতিমধ্যেই

আবহমানকালের সুজলা–সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার চিরচেনা সেইরূপ আজ প্রায় বিলুপ্তের পথে (Barkat et al., 2014)। আমাদের এই দেশে জমি ব্যবহার হয় যার-যার ইচ্ছেমতো—না, বলা ভালো যে কাজটি হয় শাসকের ইচ্ছেমতো। ফলে কমে কৃষি জমি, কমে জলা, বাড়ে ভূমিহীন কৃষক-জলাজীবী মানুষ। বাড়ে দারিদ্র্য, বাড়ে প্রান্তিকতা। পরিবেশ অমূল্য। অথচ আমাদের ভূমির ব্যবহার—অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে—এমনভাবেই হচ্ছে যে পরিবেশ-প্রতিবেশের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে, যার ফলে ভোগ করতে হবে পরম্পরায়। আইনি দলিল একটা আছে বটে, কিন্তু তা কাগজেই। রাষ্ট্রের যেখানে দায়িত্ব ছিল তার জনগণের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন এবং অধিকার নিশ্চিত করা—সেখানে 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' হবার 'রকেট গতির প্রতিযোগিতা'য় প্রতিনিয়ত ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে বর্তমানসহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের।

'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১'-এ সবচেয়ে মন্দ অবস্থা দেখা যাচ্ছে 'সুস্পষ্ট সংজ্ঞা/নির্দেশনার অভাব' নির্দেশকে (স্কোর: ০.৯)। এরপর, মন্দ অবস্থার নিরিখে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে 'প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিশ্চিতে অসামর্থ্য' নির্দেশকটি (স্কোর: ১.২)। তুলনামূলক ভালো অবস্থানে রয়েছে 'সাংঘর্ষিকতা ও 'অস্পষ্টতা/দ্ব্যর্থকতা'—এই দু'টি নির্দেশক (উভয়ের স্কোর: ৩.৫)। লেখচিত্র ১০-এ বিষয়টি একনজরে দেখানো হয়েছে। এই নীতির ক্ষেত্রে গড় স্কোর ২.৩।

লেখচিত্র ১০: স্কোরিং – 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১'-এর আইনি সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং ০= সবচেয়ে মন্দ, ৫= সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ২.৩

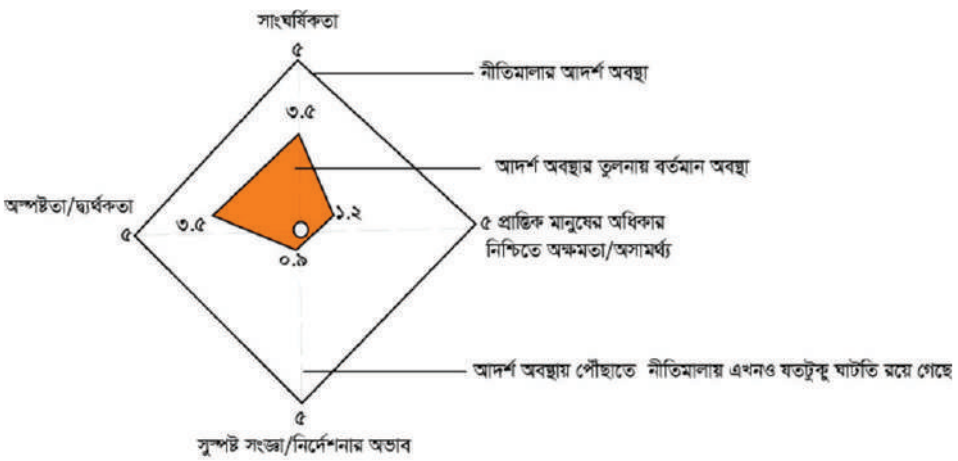

অন্যদিকে, 'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১'-এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় আছে—'সমন্বয়হীনতা'—এই নির্দেশকটি, যার স্কোর ০.৩। এর পরের অবস্থানে রয়েছে 'রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন' ও 'রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন' নির্দেশক দুটি (উভয়ের স্কোর ০.৭)। কাছাকাছি মন্দ অবস্থায় থাকা পরবর্তী দুটি নির্দেশক হলো: 'দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা' (স্কোর, ০.৮) এবং 'স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতার অভাব' (স্কোর, ০.৮)। বাকি তিনটি নির্দেশক যথাক্রমে 'জাতীয়পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি', 'সেবাবিমুখী/দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/ দপ্তর' এবং 'জনবল, লজিস্টিকস, ও বাজেট ঘাটতি'-এর

অবস্থাও বেশ মন্দের দিকেই, যাদের প্রতিটির স্কোর ১-এর কম (০.৯)। নীতিমালাটি বাস্তবায়নের গড় স্কোর ০.৮, অর্থাৎ, অত্যন্ত মন্দ—যা গবেষণাধীন সব আইন বা নীতির বাস্তবায়নের গড় স্কোরের (১.০) চেয়েও কম। লেখচিত্র ১১-এ স্কোরিংটি একনজরে দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র ১১: স্কোরিং —'জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১'-এর বাস্তবায়ন সমস্যা
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

গড় স্কোর: ০.৮

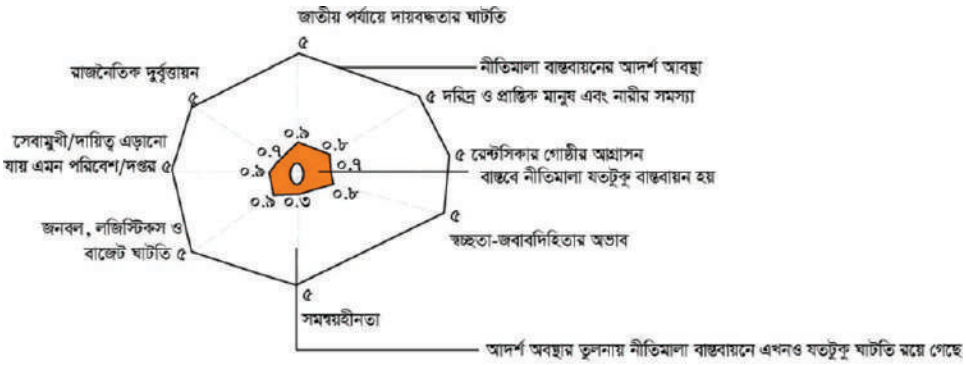

৫টি আইন/নীতিতেই যেমন রয়েছে সমস্যা, তেমনি প্রতিটিতেই বাস্তবায়ন সমস্যা প্রকট। তুলনামূলক বিচারে আইন/নীতিতে সমস্যা এবং বাস্তবায়ন সমস্যা, এই দুই বিচারেই সবচেয়ে সমস্যাগ্রস্ত হলো: জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১। সমস্যাগ্রস্ততার বিচারে দ্বিতীয় আইনটি হলো 'স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭'। লেখচিত্র ১২-এ এই ৫টি আইন ও নীতির আইনি এবং এর বাস্তবায়ন সমস্যার একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

লেখচিত্র ১২: ৫টি আইন ও নীতির আইনি এবং বাস্তবায়ন সমস্যার তুলনামূলক চিত্র
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

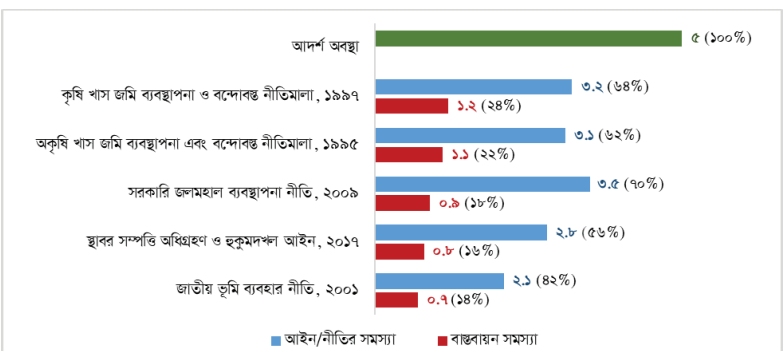

নোট: আদর্শ স্কোর ৫, অর্থাৎ ১০০%; আইনি সমস্যা এবং তা বাস্তবায়ন সমস্যার ক্ষেত্রে বন্ধনীর ভেতরের অংকটি আদর্শ অবস্থা, অর্থাৎ ১০০% এর মধ্যে শতকরা কত ভাগ অর্জিত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে।

আইন বাস্তবায়নে, স্কোরিং অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি সমস্যার ক্ষেত্রগুলো হলো রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং সমন্বয়হীনতা। আইন বাস্তবায়নের সমস্যার ক্ষেত্রে ৫টি আইনের গড় স্কোর মাত্র ০.৯, যেখানে আদর্শ অবস্থায় পৌছাতে হলে পেতে হবে ৫ (সারণি ১)।

সারণি ১: স্কোরিং—আইন বাস্তবায়নের আদর্শ অবস্থা থেকে প্রকৃত বাস্তবায়নের দূরত্ব
('০' থেকে '৫'-এর মধ্যে স্কোরিং; ০ = সবচেয়ে মন্দ, ৫ = সবচেয়ে ভালো)

আইন/নীতি	জাতীয় পর্যায়ে দায়বদ্ধতার ঘাটতি	দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ এবং নারীর সমস্যা	রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন	রেন্ট-সিকার গোষ্ঠীর আগ্রাসন	সেবাবিমুখী/ দায়িত্ব এড়ানো যায় এমন পরিবেশ/ দপ্তর	স্বচ্ছতা-জবাব-দিহিতার অভাব	জনবল, লজিস্টিকস, ও বাজেট ঘাটতি	সমন্বয়-হীনতা	**গড় স্কোর**
কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭	১.৫	১.৭	১.৬	১.১	১.২	০.৯	০.৮	১.২	**১.২**
অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা এবং বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫	১.১	১.৭	০.৮	০.৮	০.৯	১.১	১.১	১.১	**১.১**
সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯	১.১	০.৮	০.৭	০.৬	০.৯	০.৯	০.৮	১.১	**০.৯**
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭	১.১	০.৮	০.৭	০.৬	১.১	০.৯	১.১	০.৬	**০.৮**
জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১	০.৯	০.৮	০.৬	০.৬	০.৯	০.৮	০.৯	০.১	**০.৭**
গড় স্কোর	**১.১**	**১.২**	**০.৯**	**০.৭**	**১.০**	**০.৯**	**০.৯**	**০.৮**	**০.৯**

উপরুল্লিখিত ৫টি ভূমিসংশ্লিষ্ট আইনি দলিলের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা এবং রাজনৈতিক-অর্থনীতিভিত্তিক বিশ্লেষণ আমাদের এমন একটি সিদ্ধান্তেই উপনীত করে যে: অর্থাৎ, ভূমি আইন বাস্তবায়নের যে ধারা

ও পদ্ধতি, তা আমরা যে দরিদ্র ও অ-ক্ষমতা উৎপাদনকারী এবং পুনরুৎপাদনকারী একটি অর্থনীতি এবং সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনা কৌশলের কথা বলছি, সেটাকেই পোক্ত করে—রাজনীতি সেখানে শোষকের পক্ষের একটি অস্ত্রমাত্র, আর কিছু নয়। ক্ষমতায়, যে-যে নীতি নিয়েই আসুন না কেন, তা বরাবরই একটি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করতেই তৎপর; বাকিদের স্বার্থ ঠিক ততটুকু রক্ষা করা হয়, যতটুকু না করলে শাসিত শ্রেণি ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্তটুকু উৎপাদনের ক্ষমতাটুকুই হারিয়ে ফেলবে। **অর্থাৎ, ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যা যখন আমরা বিশ্লেষণ করছি—চিরে দেখছি এর ভেতর-বাহির, তখন এটি দৃশ্যমানভাবেই হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক অর্থনীতির এক 'প্র্যাক্টিকাল ক্লাস'।**

৫. গবেষণা-ফলাফলভিত্তিক সিদ্ধান্তসমূহ

আমরা কয়েকটি 'স্থির' (অন্তত, আজকের এবং নিকট ভবিষ্যতে আমাদের দেশ কিংবা তুলনীয় অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে) সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি—

ক। ভূমি, আইন, এবং আইনের বাস্তবায়ন পরস্পর নিবিড় সম্পর্কযুক্ত বিষয়—যা আমাদের জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের এক অন্যতম চালিকাশক্তি।

খ। রাষ্ট্র-অনুসৃত উৎপাদনপদ্ধতি কিংবা অর্থনৈতিক কৌশল হিসেবে ভূমি-আইন একটি অতি শক্তিশালী হাতিয়ার, যা শাসকের পক্ষে শাসিতের ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্ত সম্পদটুকু আত্মসাতের পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেয় মাত্র।

গ। আইন মন্দ, নানান দোষে দুষ্ট—নানান 'ভদ্র মোড়কে' শোষক বা শাসকের স্বার্থসিদ্ধির কাজেই লাগে। তদুপরি আইনের বাস্তবায়ন মন্দতর—আইনের যেটুকু আপাতদৃষ্টিতে ভালো, সেটুকুও শাসিতের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে সহায়তা করে না; বলা ভালো, করতে দেওয়া হয় না।

ঘ। ভূমি, ভূমি-আইন এবং ভূমি আইনের বাস্তবায়ন কীভাবে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জীবনের সাথে জড়িত এবং তার জীবনের গতি-প্রকৃতিকে গভীরভাবে-প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, তার বিশ্লেষণ একমাত্রিক নয়—বহুমাত্রিক। এই বিশ্লেষণে, বিশেষ করে ভূমি আইনের বাস্তবায়ন সমস্যাটির গভীরে (root cause) যেতে হলে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি' (Political Economy) একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার (tool)। **এটি পরিষ্কার যে, ভূমি-উদ্ভূত উদ্বৃত্ত সম্পদের আত্মসাৎ-প্রক্রিয়াটিকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেবার এক অন্যতম ক্রীড়নক হলো ভূমিসংক্রান্ত আইনকানুন—রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রায়োগিক সংজ্ঞাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। তাই, যেকোনো বিচারেই, ভূমি আইন বাস্তবায়ন সমস্যার স্বরূপটি বুঝতে 'রাজনৈতিক অর্থনীতি'র লেন্স—সর্বোতভাবেই কার্যকর এক লেন্স। ভূমিবিষয়ক আইনের মধ্যে কয়েকটি নমুনা (sample) বিশ্লেষণের এই পথ-পদ্ধতি আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করেছে যে, ভূমি মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতিভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল একটি বাস্তবানুগ এবং প্রয়োগপযোগী প্রকৃত-টেকসই-অধিকারভিত্তিক উন্নয়ন রূপকল্প তৈরি এবং বাস্তবায়নকেই সহযোগিতা করে।**

৬. উপসংহার

আদর্শ চাওয়াটি হচ্ছে এমন একটি অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতি, যেখানে 'শাসক' আর 'শাসিত' হয়ে উঠবেন একটি একক সত্তা। অর্থাৎ, আদর্শ অবস্থাটি হচ্ছে এমন—যেখানে 'শাসক = শাসিত'। কিন্তু আমরা তা সে যে নামে যে বর্তমান যে রাষ্ট্রব্যবস্থা– তা সে যে নামে যে পদ্ধতিতেই পরিচালিত হোক না কেন—কোনোভাবেই এমন একটা অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে দেবে না যেখানে 'শাসক = শাসিত' এমন সমীকরণ সত্য হয়ে উঠবে। এমতাবস্থাকে যদি আপাতত সত্যি বলে মেনে নিই, বাস্তবতা হিসেবে

স্বীকার করে নিই—তাহলে আমরা একটি 'প্রায় সমান (≅)' অবস্থার দিকেই যেতে চাইব; যদিও আমরা খুব ভালোভাবেই জ্ঞাত আছি যে 'প্রায় সমান' অবস্থা কোনো প্রকৃত সমাধান দেবে না। তারপরও, যখন নিকট বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতি এবং অর্থনীতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এ কথা বলাই যায় যে 'সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লব' তৈরির মতো কোনো ভ্রূণাবস্থাও কোথাও বিরাজ করে না—সে রকম একটা সময়ে এবং অবস্থানে আমরা সচেতনভাবেই 'শাসক' এবং 'শাসিত' এই দুই সত্তাকে 'প্রায় সমান' কীভাবে করা যায়—সেই পথনির্দেশের সন্ধান করেছি। অর্থাৎ, আমাদের এই গবেষণা ততটুকুই করতে পারে—যেখানে ওই তথ্যভিত্তিক জ্ঞানকাঠামো এমন একটি অবস্থার দিকে নিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারে, যেখানে 'শাসক ≅ শাসিত'।

আমরা এটি জানি, 'প্রায় সমান' অবস্থায় নেবার মতো আমাদের গবেষণা-উদ্ভূত এসব সুপারিশমালা তথাকথিত 'সিভিল সোসাইটি'র কার্যক্রমের সাথেই তুলনা করবেন অনেকে। সে তারা করতেই পারেন। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমরা ওইটুকুই ভিন্ন, যতটুকু ভিন্ন হলে বলতে পারা যায় যে—আইন, রাজনীতি, অর্থনীতি কোনো ভিন্ন প্রপঞ্চ নয়। আমরা ওইটুকুই ভিন্ন, যেখান থেকে বলা যায় যে 'ভূমি আইনের সমস্যা' কোনো 'আইনি সমস্যা' নয়—এটি সব বিচারেই রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়। আমরা এইটুকুই শুধু ভিন্ন, যখন বলা যায় যে 'খুপড়িভুক্ত' দৃষ্টি এবং গবেষণা দিয়ে ভূমি আইনের সমস্যার আইনি বিশ্লেষণ করা সম্ভব বটে, কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন-অধিকারমুখী কোনো বাস্তব ফলাফল তাতে অর্জিত হবে না।

এটুকু আমাদের জানা আছে, 'নয়া-উদারবাদ'-এর 'মহা-ফাঁদ' পেতে রাখা বর্তমান যে বিশ্ব, সেখানে যিনি দুর্বল, ক্ষমতাকাঠামোর বাইরে যার অবস্থান, আইন ছাড়া আর তার অন্য কোনো পথ খোলা নেই। আমরা জানি, আইনের প্রয়োগ-অধপ্রয়োগ-অপপ্রয়োগ সবচেয়ে নিষ্ঠুরভাবে ঘটানো হয় এই 'বহিঃস্থ' মানুষের ক্ষেত্রেই। রেন্ট-সিকার, দুর্বৃত্ত প্রভাবশালীরাই শেষ পর্যন্ত ভূমির দখল রাখে, ন্যায্য হিস্যা হারায় বাকিরা। তারপরও আইনি দলিলে যা বলা আছে, যা করবার কথা বলা আছে কাগুজে দলিলে—তার যথাযথ প্রয়োগ হলে, তা অন্তত মন্দের ভালো হতে পারে। ভূমি বিষয়ে সব আইনকে অধিকারভিত্তিক ও সুসামঞ্জস্য ও একটি কাঠামোর মধ্যে এনে, কাঙ্ক্ষিত সংস্কার নিশ্চিত করে, জনসম্পৃক্ত একটি বাস্তবায়ন-পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং মাঠপর্যায়ে তার যথাযথ প্রতিফলন ঘটানোর মধ্যে দিয়ে অন্তত, যাত্রা শুরু করতে পারে 'শাসিত'কে 'শাসক'-এর 'প্রায় সমান' করে তুলবার বন্ধুর রাস্তায়। অন্যথা, দরিদ্র মানুষ, কৃষক-জলাজীবী-বনজীবী, অভিবাসীসহ সব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও নারীর ভূমি অধিকার—তথা ন্যূনতম মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করবার দিকে এগোনোই সম্ভব হবে না; সম্ভব হবে না 'বাদপড়া' জনগোষ্ঠীকে শোভন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করবার দীর্ঘ সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দেওয়া।

আমরা অনুধাবন করতে পারি, আদর্শ অবস্থান থেকে আইনের অবস্থান অনেক দূরে, আবার সেই অবস্থান থেকেও বাস্তবায়ন অবস্থার দূরত্ব অনেক—রেন্ট-সিকার পরিবেষ্টিত, দুর্বৃত্তায়িত রাষ্ট্রব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃত উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো ভূমির ওপর কৃষিজীবী-জলাজীবী-বনজীবী মানুষের মালিকানা (শুধু অভিগম্যতা বা access নয়) নিশ্চিত করা। অধিকারভিত্তিক ভূমি আইন এবং এর যথার্থ প্রয়োগ ছাড়া, সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে, দরিদ্র মানুষ-প্রান্তিক জনগোষ্ঠী-নারীর জীবনে কোনো ন্যূনতম ইতিবাচক পরিবর্তনেরও টেকসই সমাধান সম্ভব না। কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার—রাজনৈতিক বিষয়। আইনি সংস্কার এবং তার পরিপূর্ণ প্রয়োগ ছাড়া ভূমি-সংস্কার সম্ভব নয়। প্রয়োজন— বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মৌলিক সংস্কার। যদিও আমরা ভালো করেই জানি, বিদ্যমান রাষ্ট্রীয়

উন্নয়ন কৌশল, অর্থনৈতিক পদ্ধতি, শাসনব্যবস্থায় আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হলেও 'শাসক' কখনোই 'শাসিত'-এর সমান হয়ে উঠবেন না; বড়জোর তারা হয়ে উঠতে পারেন 'প্রায় সমান'। ভূমি সমস্যার প্রকৃত-অধিকারভিত্তিক সমাধান চাইলে বিষয়টিকে দেখা চাই বড় পর্দায়, এবং পুরোমাত্রায় একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং গণমানুষের সম্পৃক্ততা আইন বাস্তবায়নে জরুরি। আইনের সংস্কার যতই হোক না কেন, দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ নারীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং শোভন রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা ছাড়া এর বাস্তবায়ন অসম্ভব।

তথ্যপঞ্জি

এএলআরডি (২০১৯), *জমি-জমার কথা*। ঢাকা: এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট।

কজ্‌লোভ, গ. আ. (সম্পা.). (১৯৬৮), *রাজনৈতিক অর্থনীতি: পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা* (মূল গ্রন্থ রুশ ভাষায়)। মস্কো: মিস্‌ল প্রকাশনা।

কজ্‌লোভ, গ. আ. (সম্পা.). (১৯৮০), *অর্থশাস্ত্র: পুঁজিবাদ*। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

কেল্লে, ভ., ও কোভালসন, ম. (১৯৭৫), *মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের রূপরেখা—ঐতিহাসিক বস্তুবাদ*। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৫), *অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা*। ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৭), *কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা*। ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০১), *জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি*। ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০৯), *সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি*। ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১১), *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, সর্বশেষ সংশোধনীসহ মুদ্রিত, অক্টোবর ২০১১। ঢাকা: লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০১৭), *স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন*। ঢাকা: ভূমি মন্ত্রণালয়।

দেবনাথ, এন. সি. (২০০০). *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

বারকাত, আবুল (২০২০), বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল., সেনগুপ্ত, সুভাষ. কুমার., এবং রহমান, ওবায়দুর (বাংলা অনুবাদ, ২০০৯), *বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি*। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

বারকাত, আবুল (২০১৬), *বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল (২০১৬খ), বাংলাদেশে কৃষি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি। *অধ্যাপক ড. মুশাররফ হোসেন স্মারক বক্তৃতা*। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের যৌথ উদ্যোগের আঞ্চলিক সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা। রাজশাহী: জুলাই ১৬, ২০১৬।

বারকাত, আবুল (২০১৯গ), *উৎপাদন পদ্ধতি: তত্ত্ব, এশিয়াটিক, ইতিহাস রচনায় প্রাসঙ্গিকতা, প্রাক্-পুঁজিবাদী চীন, আমেরিকা, বাংলাদেশ*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল (২০২০), *বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে।* ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল (১৯৮৪). "বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি: বিতর্ক, পদ্ধতিগত সমস্যা ও সমাধান"। সমাজ অর্থনীতি ও রাষ্ট্র, খণ্ড ১, সংখ্যা ১, ঢাকা: সমাজ গবেষণা কেন্দ্র।

বারকাত, আবুল (২০০৪). "বাংলাদেশের রাজনৈতিক—অর্থনৈতিক চালচিত্র: কোথায় যেতে হবে, কোথায় যাচ্ছি?" *বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী-২০০৪*, পৃ. ৩-৩৮, ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

বারকাত, আবুল (২০০৫), *দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক-অর্থনীতিতে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও মানব উন্নয়ন প্রসঙ্গ: বড় কাঠামোয় বিশ্লেষণ জরুরি*। বাংলাদেশ কনজুমার সোসাইটি। ঢাকা: আগস্ট ২, ২০০৫।

বারকাত, আবুল, জামান, শফিক উজ, এবং রায়হান, সেলিম (২০০৯), *বাংলাদেশে খাস জমির রাজনৈতিক অর্থনীতি: জমি-জলায় দরিদ্রের অধিকার*। ঢাকা: পাঠক সমাবেশ।

বারকাত, আবুল., গা. মো. সোহ্‌রাওয়ার্দী., ওসমান, আ., ও ইসলাম, মো. অ. (প্রকাশিতব্য: ২০২২), ভূমি আইনের রাজনৈতিক অর্থনীতি: *বাংলাদেশে খাস জমি, জলমহাল, অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল, ভূমি ব্যবহার আইন, নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সমস্যা*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল, ও সোহ্‌রাওয়ার্দী, গা. মো. (২০১৯), *বাংলাদেশের কৃষি: পত্তনি চাষ এবং চুক্তিবদ্ধ চাষের রাজনৈতিক অর্থনীতি*। ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

বারকাত, আবুল., হক, কাজী এবাদুল., আহমেদ, এ. কে. এম. জহির., উল্লাহ, মো. রহমত., হেলাল-উজ-জামান, এ. কে. এম., চৌধুরী, টি. আই. এম. নুরুননবী., আহমেদ, কাওসার., সেনগুপ্ত, সুভাস কুমার., ওসমান, আসমার (২০২০), *বাংলাদেশের ভূমি আইনের অধিকারভিত্তিক বিশ্লেষণ—প্রস্তাবিত আইন ও সংশোধনী (খণ্ড ১-১৩)*। ঢাকা: মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন।

মার্কস, কার্ল (১৯৮৩), *অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসঙ্গে*। মস্কো: প্রগতি প্রকাশন।

রহমান, মোঃ. আনিসুর (২০০৮), বাংলাদেশে গ্রামীণ আর্থসমাজ সংস্কার। হুদা, শামসুল (সম্পা.), *দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসানে ভূমি, কৃষি ও জলা সংস্কার অপরিহার্য* (পৃ. ৯-১৬)। ঢাকা: এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট।

Abdullah, A. (1976). "Land Reform and Agrarian Change in Bangladesh", *The Bangladesh Development Studies,* Vol. 4, No-1, January.

Barkat, A., & Roy, P. K. (2004). *Political Economy of Land Litigation in Bangladesh: A Case of Colossal National Wastage*. Dhaka: Association for Land Reform and Development (ALRD) and Nijera Kori.

Barkat. A., Suhrawardy, G. M., & Ghosh, P. S. (2011). *Commercialization of Agricultural Land and Water Bodies and Disempowerment of Poor in Bangladesh.* Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC) and Association for Land Reform and Development (ALRD).

Barkat, A. et al. (2014). *Land Laws in Bangladesh: A Right-based Analysis and Suggested Changes* (in 22 vol.). Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC) & Manusher Jonno Foundation (MJF).

Barkat. A., Suhrawardy, G. M., & Osman, A. (2015). *Increasing Commercialisation of Agricultural Land and Contract Farming in Bangladesh.* Dhaka: Human Development Research Centre (HDRC) and Association for Land Reform and Development (ALRD).

Barkat, A., Suhrawardy, G. M., & Rahman, M. I. (2019). Khas Land: The Denial of Access. In A. Barkat (Ed.), *Bangladesh Land Status Report 2017: Land grabbing in a rent-seeking society.* Dhaka: MuktoBuddhi Publishers.

Blaug, M. (1997). *Economic theory in retrospect* (5th Edition). Cambridge: Cambridge University Press.

Charles, G. and Rist, C. (1948). A History of Economic Doctrine (2nd ed.). London: George G. Harrap & Co Ltd.

Chowdhury, A. M., Hakim, A., and Rashid, S.A. (1997). "Historical Overview of the Land System in Bangladesh". Land. vol. 3, no. 3. Philippines, Manila: Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development

Dale, P., Mahoney, R., and McLaren, R. (2007). Land Markets and the Modern Economy. UK: RICS.

Deane, P. (1989). *The State and the Economic System: An Introduction to the History of Political Economy.* Oxford: Oxford University Press.

Harvey, D. (2005). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University

Herrera, A. (2016). *Access to Khas Land in Bangladesh: Discussion on the Opportunities and Challenges for Landless People, And Recommendations for Development Practitioners.* Essay on Development Policy, NADEL MAS-Cycle 2014-16.

Hossain, T. (1995). *Land Rights in Bangladesh: Problems of Management. Dhaka: The University Press Limited.*

Kozlov, G. A., (Ed.). (1977). *Political economy: Socialism*. Moscow: Progress Publishers.

Nikitin, P. I. (1983). *The fundamentals of political economy,* (J. Sayer, trans.). Moscow: Progress Publishers.

Raihan, S., Fatehin, S., and Haque, I. (2009). *Access to Land and Other Natural Resources by the Rural poor: The Case of Bangladesh. Dhaka: SANEM.*

Roll, E. (1992). *A history of economic thought.* London: Faber and Faber Limited.

Ryndina, M. N., Chernikov, G. P., & Khudokormov, G. N. (1980). *Fundamentals of political economy.* Moscow: Progress Publishers.

Ryndina, E. A. (1978). *Political economy of capitalism.* Moscow: Progress Publishers.

Siddique, K. (1997). Land Management in South Asia: A Comparative Study. Dhaka: The University Press Limited.

Sobhan, R. (1993). *Agrarian reform and social transformation: Preconditions for development.* Dhaka: The University Press Limited.

Yusuf, A. (Eds.) (2011). Agriculture of Bangladesh—Capitalistic or Semi-Feudalistic (In Bangla). Dhaka: Pathok Shamabesh.